বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ODBL গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার লিখিত ধবনিতাত্ত্বিক রূপ বিষয়ে আলোচন া করবার সময়ে Bengali Orthography শীর্ষক সংযোজিকায় বলেছেন যে প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেখি সপ্তম শত াব্দী থেকেই বর্গীয় ব আর অন্তঃস্থ ব-এর মধ্যে (b এবং v এর মধ্যে) একটু গোলমাল বা গুলিয়ে ফে লার প্রবণতা দেখা য াচ্ছে। লিপিতে ভুল বানানে সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে (দ্রঃ মদনপাল দেবের মানাহালি শাসন -আনুমানিক ১১১৮ খ্রিষ্ট াব্দ) বলে বুঝতে পারছেন যে তখনই তালব্য শ আর দন্ত স-এর নির্বিচার ব্যবহার, তখনই ঋ - এর উচচারণ 'রি' ক্ষ (ক্ষ) -এর উচচারণ ক্খ উচচারণ বা ধবনি যে পাল্টাচ্ছে এর তো কোনও ক্যাসেট বা রেকর্ডনেই, বুঝতে হচ্ছে পাথরে খোদাই - করা লিপি থেকে। ভুল বানান থাকার জন্যই এই ধবনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলেন বলে তিনি লিখেছিলেন We are thankful for these mistakes- ভুল বানান সংস্কৃত লেখা হত। হাজার বছর আগেও হত। তাই বেশি হাহুতাশ করবার দরকার নেই আজকের অবস্থা দেখে।

বাংলা পুঁথিগুলিতে বানান ভুলের বৈচিত্র্যও দেখাবার মতো। সপ্তদশ শতকের আগেকার পুঁথি বেশি পাওয়া যায় না -অ াগে রচিত হলেও পুঁথি লেখা পরেকার। ভুলটা কবি নিজেই করেছেন না লিপিকার করেছেন তা বুঝবার উপায় নেই। লিপিকারেরা দিব্যি বলে রাখতেন
----'লিখ্যকের দোষ নাই, মূনিনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীমস্বাপি (ভীমস্যাপি) রণে ভঙ্গা, যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং।' 'লেখক' হয়ে গেল 'লিখ্যক', 'ভীমস্যাপী' হয়ে যায় 'ভীমস্বাপি' ---লোকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। দেখে শুনে সুননীতিকুমার মন্তব্য করেছিলেন---

Scribes were careless, and they were careless with regard to Sanskrit words. There were no uniformity. The Same word being written differently in the same page and in the same line.
ছাপাখানাতে যেমন কম্পোজিটররা অনেক রকমের ভুল করেন লিপিকাররা তেমনি বিচিত্র ধরনের ভুল করতেন।আমাদের কাছে সেটাই চলে আসছে। তৎসম শব্দগুলির বানান যাতে নির্ভুলভাবে লেখা হয় তা দেখতে শু করেছিলেন পণ্ডিতেরা, ত াও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ---যখন ছাপাখানা এদেশে এসে গিয়েছিল।

সুনীতিকুমারের দুঃখ ছিল এই যে এই পণ্ডিতদের এঁদের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে অনাবশ্যকভাবে প্রসারিত হয়েছিল তদ্ভব শব্দগুলির ক্ষেত্রেও এবং তৎসম শব্দের বানানরীতি তদ্ভব ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হচ্ছিল। এজন্য জে, জাহা, জিনি, জত, জাওয়া এইসব শব্দগুলি যে, যাহা, যিনি, যাওয়া বলে লেখা হতে লাগল, যেহেতু সংস্কৃততে যদ্ শব্দ, যা ধাতু ছিল এসব শব্দের মূলে। তখন কার্য থেকে কার্জ না লিখে কর্য হত অথচ কার্য (>) কজ্জ (>) কাছ ছিল এর বুৎপত্তির ধারা।
এঁরা কান-কে কাণ লিখতেন, রানি বা রাণী -কে লিখতেন রাণী, সোনা না লিখে সোণা যেহেতু কর্ণ, রাঞ্জী,স্বর্ণ ছিল এসব

শব্দের মূলে। কর্ণ > কন্ন > কাণ, রাজ্ঞী > রান্নী > রাণী, স্বর্ণ (ক) > সণ্ন (অ) > সণ্ন (অ) > সোণা এইভাবে ণ -ত্ববিধি বজায় রাখতে চাইতেন তাঁরা।
১৩২৩ সালের ৩১ চৈত্র অর্থাৎ ১৯১৭ সালে বাঙ্গালাভাষার অভিধানের প্রথম সংস্করণের ভুমিকায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছিলেন
যে সকল সংস্কৃত শব্দ বিভক্তিবর্জিতমাত্রা হইয়া বাঙ্গালায় অবিকল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বানানে বিকৃতি নাই। প্রকৃতজ অর্থাৎ মূল বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দের বানান লইয়াই যত গোল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখিয়াছিলেন হ্রস্ব-ই-দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ দীর্ঘ, এ-কার এবং অ্যা-কার, বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ-ব, তালব্য-শ মুর্ধণ্য-ঘ, এবং দন্ত্য-স এইগুলি হচ্ছে গোলমালের জায়গা। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বর্গীয়-ব দিয়ে প্রচলিত ও ব্যবহৃত এবং অপ্রচলিত শব্দের সংখ্যা সাড়ে ছ -শো কিন্তু অন্তঃস্থ ব দিয়ে শব্দ সাড়ে পাঁচ হাজার। তাঁর মত ছিল 'অন্তঃস্থ-ব এর বিশুদ্ধ উচচারণে অভ্যস্থ হইবার প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।'
অন্য একজন অভিধানকার 'শব্দকোষ' রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

বাংলা শব্দের বানান এক বিষম সমস্যা ; এখনও উহার সমাধান হয় নাই, হইবে কিনা জানিনা। প্রাচীন বাঙলায় কবির হস্তলিখিত পুথি অতিদুর্লভ। দ্বিতীয়ত, লিপিকরগণ প্রায়ই পণ্ডিত ছিলেন না ; তথাপি প্রতিলিপির সময় যদি তাঁহারা মুল পুথির অবিকল নকল করিতেন, তাহা হইলেও কবির অভিমত বা তাঁহার সময়ে প্রচলিত শব্দের বানান পাওয়া যাইত। কিন্তু নিরঙ্কুশ লিপিকরগণের স্বেচ্ছাচারিতায়, তাহারও উপায় নাই -- তাঁহারা বানানে ইচ্ছামত কলম চালাইয়াছেন ; ফলে একই লিপিকারকের প্রতিলিপিতে একই শব্দের নানা বানান পাওয়া যায়। (দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ --- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ আশ্বিন ১৩৩৯ (১৯৩২) পৃঃ ১৮) হরিচরণ বন্দ্যোপাদ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আমল থেকে শান্তিনিকেতনে কাজ করছিলেন। তাঁর প্রথম বাসনা ছিল এমন একটা অভিধান সংকলন করবেন যাতে বাঙলাছাড়া সংস্কৃত শব্দও পাওয়া যাবে -- পরে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি অপ্রচলিত তৎসম শব্দ বর্জন করলেন এবং তদ্ভব, দেশী বিদেশী যা-ই হোক না কেন বাঙলায় ব্যবহৃত ও প্রচলিত সব শব্দই গ্রহণ করলেন।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে part – time professor নিযুক্ত হন। ১৯৩৪- পর্যন্ত সে-কাজ তিনি করলেনও। তাঁকে সহায়তা করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন গবেষণা - সহায়কের পদ তৈরি করলেন। সে - পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে রবীন্দ্রনাথেরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিভাষা সংকলন এবং বানান সংস্কারের কাজ চলেছিল। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানবিধির গোড়ায় কথা'-য় ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন যে১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের কার্যকাল শেষ হলে শান্তিনিকেতনেপরিভাষা আর বানানের কাজ বন্ধ হল। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়কে বলে চলিত ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি তৈরি করে দেন। এই সমিতিই ১৯৩৭ সালে বাংলা বানানের নিয়মের যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করলেন সেটিই বাংলা বানানের মান্যপ নির্ধারণের আলোকস্তম্ভ। এরপর থেকে প্রকাশিত প্রায় সব অভিধন, বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানবিধিটি মান্য হয়ে আসছে।

'মান্য' হয়ে আসছে মানে এই যে এর পর থেকে এই নিয়মবিধি মেনেই সব ছাপা হতে লাগল। খবরের কাগজ যা লোকে রোজ পড়ে তাতে এই নিয়ম মানা হত না, পাঠ্য বইতেও এই নিয়ম মেনে চলা হয়নি। আসলে এই বিধি-র বিদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল, যার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এই বানানবিধি অবশ্য পালনীয় নয়। ঝড় উঠবার কারণ ছিল হয়তো একাধিক কিন্তু বড়ো একটি কারণ ছিল -- যে - জায়গায় বানানে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না সেই জায়গাতেই এঁরা হাত দিলেন, সেটি হল রেফের পরে দ্বিত্ব হওয়ার রীতি। দ্বিত্ব বর্জনের বিধানটিতে

অতঃপর কর্ম্ম, ধর্ম্ম, কার্য্য, কার্ত্তিক এইসব জায়গাতেই কর্ম কার্য কার্তিক লেখার সুপারিশ করা হয়েছিল। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বানান' (১৯৭৮)-বইটিতে লিখেছিলেন এই সংস্কারটি না হলে সেকালে বানান- সংস্কার - সমিতির বিদ্ধে এতটা প্রবল আন্দোলন হত না।
অথচ বানান সংস্কার সমিতির যে জায়গায় কাজ করবার, কথা, চলিত ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করা--সেই বানান কিন্তু খুব সুনির্দিষ্ট হয়নি।

শব্দতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ১২৯২ (১৮৮৫) থেকেই দেখা যায়। তাঁর কতগুলি নিজস্ব প্রবণতাও ক্রমশ গড়ে ওঠে। সেগুলি মোটামুটি এহরকম ঃ অতৎসম শব্দে উচচারণ অনুযায়ী বানান, হ্র স্ব-ই কারকে প্রতিষ্ঠিত করা, 'ঈ'-এর বদলে একক 'ঙ'-কে মর্যাদা দেওয়া, বর্গীয় জ-এর প্রাধান্য, মূর্ধন্য ণ-এর নির্বাসন, বিসর্গের বিসর্জন, ও-কারের আবাহন, ই-কার ও ও-কারের দু একটি বাংলা সন্ধি।' (বাংলা বানান ঃ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ)

মণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা থেকে জানতে পারছি যে, রবীন্দ্রনাথের নুতন রীতি কেউ সাদরে বরণ করে নিলেন, কেউসুতীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে এদের উচ্ছেদসাধনে অগ্রসর হলেন। স্বৈরাচার আরম্ভ হল। এই স্বৈরাচার অরাজকতায় পরিণত হল । সবুজপত্রের যুগে যখন মৌখিকভাষা লৈখিক ভাষায় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করল ভাষায় তখন নতুন নতুন শব্দের আমদানি হতে লাগল এবং উচচারণানুযায়ী বানানের ঝোঁক প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। অথচ ভালইহোক, মন্দই হোক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বানানের একটি রীতি গড়ে উঠেছিল, বিশৃঙ্খলা খুব একটা ছিল না। এই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মানুষদের প্রীতি প্রবল ছিল সেজন্য যত্ব-ণত্ব মেনে চলতেন। তাঁদের উচচারণে government এর 'ণ' অনুচচারিত নয়, রেফের পরে ন ধবনি বলে তাঁরা অভ্যাসবশত লিখতে
ন 'গভর্ণমেন্ট', তেমনি 'গভর্ণর', গুডমর্ণিং, ওয়ারেণ হেস্টিংস, বায়রণ। অ-কার আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরধবনির পর স-কে তাঁর সর্বদা-ষ করে দিতেন সেজন্য তাঁরা জিনিষ, পোষাক, তোষক, পাপোষ লিখতেন, মূর্ধন্য বর্ণ ট-এর সঙ্গে সর্বদা মূর্ধণ্য ষ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা এর ব্যতিত্রম রাখতেন না-তাই লিখতেন, পোষ্ট, ব্যারিষ্টার, ষ্ট্যাম্প, ওয়ারেন হেন্টিংস, ষ্টেশন, মাষ্টার, অষ্ট্রেলিয়া। একই রকম লিখতেন বানান ভূল করতেন না। তবে সংস্কৃতপ্রীতি প্রবল হওয়ার জন্য Shakespear হয়ে যেত সেক্ষপীয়র, Maxmullcr হয়ে যেতেন মোক্ষমূলার।
মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে।
উচচারণ-অনুযায়ী বানানের ঝোঁক সবুজপত্রের যুগের পর থেকে যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল তখনই স্বৈরাচার শু হল। স্বৈরাচার কেননা সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের রূপ বিকৃত হয়েছে। উচচারণ অনুযায়ী বানান হয়নি। অভ্যাস হল অভ্যেস, সুবিধা হল সুবিধে, সন্ধ্যা হল সন্ধে, বিদ্যা হল বিদ্যে। উচচারণ - অনুগ বানান হলে এগুলি হত যথাত্রমে ওব্ভেশ, সুবিধে, শোন্ধে, বিদ্দে। তা কিন্তু হয়নি (ইদানীং 'সন্ধে'-ও লিখছেন কেউ কউ)। ডিজ্ঞাসা শব্দের গোটা আষ্টেক রূপ পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস, জিগ্‌গেশ, জিগ্‌গেঁস, জিগ্‌গেঁশ, জিগেশ, জিগেস, জিজ্ঞাসা তো আছেই গ্যালো, দ্যাখো, গ্যাছে যে গেল, গেলো, গেল গ্যাল, গ্যালো দেখ দেখো, দ্যাকো, দে'খ, দেখ', গেছে, এইরকম নানারূপের বানানে সব লেখা ভরে উঠতে লাগল। হিউয়েন সাঙ -এর নামের বানান জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে আছে ১৮টা। এটা অবশ্য ভিন্ন রকমের সমস্যা একটা বিদেশী শব্দের মান্য একটা রূপ স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। Goethe গেটে, গ্যেটে, গ্যয়টে কী হবে ? Volks-wagon ভোক্‌স-ওয়াগন না ফোকস- ভাগো ? Wagner কি ওয়াগন
ার না ভ্াগনার না ভাগনার ? German Germany কি জার্মান, জার্মানি ? তেমনি নাট্‌সি, নাটসি, নাৎসি, নাৎসী, নাজি ? এসবের নানা চেহারা নানা মানুষের লেখায় পাচ্ছি। এগুলির কথা বাদ দিলেও দেখি ১৯৩৭ সালের বানান সংস্কারের পরও বাংলা বানানে যে অসঙ্গতিগুলি রয়ে গেছে যার পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই উঠেছে -- সে গুলি নিয়ে

সকলেই অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটিয়ে গেলেন।

আলোচনা আনেকদিন ধরে চললেও তেমন কাজ কিছু হয়নি। এর মধ্যে অনেক গুত্বপূর্ণ। ঘটনা গেল ঘটে। ১৯৪৭ সালে ১৫ই অগাস্ট ভারত ভাগ হল। বাংলা ভাগ হয়ে এক অংশ হল পশ্চিমবঙ্গ বা দ্বিখণ্ডিত ভারতের অংশ।)যার ইংরেজি অনুবাদ হল (West Bengal) । পুর্ব পাকিস্তান সরকার তৈরি করলেন একটি কমিটি যার উদ্দেশ্য হল
গোটা পাকিস্থানের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার জন্য করণীয় কাজ নির্ধারণ। সে জন্য ভাষাকে সরল করা, সংস্কার কর া, সর্বজন গ্রাহ্যরূপ নির্ণয় করা, নতুন শব্দ ও নতুন পরিভাষা ইত্যাদি কোন নিয়মে হবে তা স্থির করা এই হল কমিটির ক াজ। মহম্মদ আত্রাম খাঁ, আবদুল্লাহ আল বাকী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. এস. আফজল -- এইরকম দশ বারোজন পণ্ডিত ১৯৫০-এর ৭ই ডিসেম্বর ভাষা কমিটির সুপারিশ পেশ করলেন। কিন্তু সুপারিশগুলি প্রকাশিত হলআট বছর পর। এঁরা বর্ণমালা এবং বানানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিলেন-- যেমন বণমালা থেকে এঁরা তুলে দিতে চেয়েছিলেন দীর্ঘ ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ঢ়, য, স, অন্তস্থ ব, খণ্ডৎ, ক্ষ। এঁদের আর একটি সুপারিশ হল শব্দের ডানদিকেই সর্বদা যোজ্য চিহ্ (অ-কার দিতে হবে)।
১৯৫৮ সালে এনামূল হক, মহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী এই সুপারিশের বিদ্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে স্বাক্ষর করলেন।
এই সংস্কার সমিতির সুপারিশ মূলত অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

ত্রমশ নানা ঘাতপ্রতিঘাত বিক্ষোভ, বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে বাংল াদেশের জাতীয় শিক্ষাত্রম এবং টেকস্ট বুক বোর্ডের উদ্যোগে সর্বজনীন শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্য বইতে বাংলা বানানের সমতাবিধানের জন্য জাতীয় কর্মশিবির হয়। এই কর্মশিবির থেকে বেরিয়ে এল একটা সুপারিশ। এঁরা চেয়েছিলেন একই শব্দের হ্রস্ব দীর্ঘ বানানরূপ থেকে কোনটি গ্রহণীয় যে বিষয়ে একটা নীতি নির্ধারণ করতে, যুক্ত ব্যঞ্জনের স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট রূপ ব্যবহার এবং প্রতিবর্ণীকরণের নীতি নির্ধারণ করতে।

রেফের পর দ্বিত্ববর্জন, সন্ধিতে ম-এর জায়গায় অনুস্বার (ং) বিভক্তি যুক্ত হলে ঙ (রং-কিন্তু রঙের) হস্‌চিহ্ ও ঊর্ধবকমা বর্জন, অতৎসম শব্দে অভিধান সমর্থিত হলে ই-কার (পাখি, বড়), ক্ষ-কে অক্ষুণ্ণ রাখা (অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ), ভাষা ও জা তির ক্ষেত্রে ই প্রত্যয় (জাপানি, ইংরেজি), আলি প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-কার (রূপালি, সোনালি), হ্রস্ব -ইকার যুক্ত -টি ছাড়া একটি গুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ই-কার (কাকী, মামী, চাচী, পাগলী)। এমন সুপারিশ এঁদের ছিল যা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র সুপারিশের কাছাকাছি। কেবল ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শব্দের বেলায় আরবি যে ায়াদ ও যালের জন্য অন্তস্থ য-এর সুপারিশটি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। এঁরা চাইলেন আযান, ওযু, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, র ামযান, হযরথ এইভাবে লিখতে। 'সোয়াদ' এবং 'সিনে'র জন্য দন্ত্য স এবং 'শিনে'র ক্ষেত্রে তালব্য শ ব্যবহার করতে হবে এটাও এঁদের সুপারিশ।
১৯৯১ সালে মাহাবাবুল হক লিখলেন 'বাংলা বানানের নিয়ম'। বানান সংস্কার নয়--- শুদ্ধ বানান শেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। বইটির বেশিরভাগ অংশই অবশ্য তৎসম শব্দ নিয়ে।

কলকাতা ৰিবিদ্যালয়ে ১৯৮১ সালে নতুন করে বাংলাবানানের নিয়ম স্থির করবার জন্য 'বাংলা বানানের নিয়ম' সমিতি স্থাপিত হল। এই সমিতির সভাপতি হলেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতি নতুন প্রস্তাব পেশ করে সকলের কাছে অভিমতের জন্য পাঠালেন। তাতে প্রথমই তৎসম শব্দের যেখানে বিকল্পে ই-কার সিদ্ধ সেইরকম শব্দগুলিকে গ্রহণ করার প্রস্তাব ছিল (পল্লি, যুবতি, শ্রেণি, তরি)। বিভ্রান্তি শু হল---(অংক, অংকণ, অংকিত, অংগ, অংগদ, মংগল)। এঁরা সংগে, সংগি এসব বানানও চাইলেন। এঁদের একটি গুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল ইন্-ভাগান্ত শব্দকেই-কার দিয়ে গ্রহণ করার প্রস্তাব (গুণি, মানি), এ প্রস্তাবে মণীন্দ্রকুমার ঘোষেরও সায় ছিল।

এছাড়া ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ন্‌চ, ন্‌ছ, ন্‌জ, ন্‌ঝ দিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন এঁরা।

এর মধ্যে কিছু বৈপ্লবিক প্রস্তাবও এল। এ প্রস্তাব অধ্যাপক জগন্নাথ চত্রবর্তীর। নতুন বাংলা বানান'বলে এঁর প্রস্তাববেরোল ২৩-বি বাদে রায়পুর রোড, কলকাতা -৩২ (ওঁর বাড়ির ঠিকানা) থেকে। ইনিও দীর্ঘ ঈ, ঊ, ঋ, ৯ ঐ ঔ বাদদিয়ে স্বরবর্ণে অ্যা ঢুকিয়ে মূর্ধন্য ণ ও য বাদ দিয়ে, সর্বত্র ডানদিকে যোজ্যচিহ্ (আ-কার, ই-কার, ও-কার) দিয়ে, যুত্তাক্ষর ভেঙে ফুটকি দিয়ে যুত্ততা বুঝিয়ে (যেমন জগন্নাথ হবে জগন, নাথ) লেখার প্রস্তাব দিলেন। বলা বাহুল্য এতটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন লে াকের সয় নি--পূর্বপাকিস্তানে মহম্মদ শহীদুল্লহের 'সোজা বাঙ্‌লা-'র প্রস্তাবের মতো এটাও লোকে অগ্রাহ্য করে।

১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 'বাংলা বানানসংস্কার / একটি ভিত্তিপত্র' প্রকাশ করে অভিমতের জন্য নানা বিদ্বজ্জনের এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯৯৫ সালে এখান থেকে একটি সুপারিশপত্র বার করা হয়। এই সুপা রিশপত্রের নাম পাল্টে যায়। 'বানান সংস্কার' নয় এর নাম হয় 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতির ও লিপির সরলীকরণ' ছিল সুপারিশপত্রের নাম। জোরটা পড়ে বিকল্পবর্জন, যুত্তাক্ষরের মুদ্রাণপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনা (ত্ত নয় ক্‌ত, ন্ধ নয় ন্‌ধ) এবং সমতাবিধানের উপর।

বানান নিয়ে যাঁরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। তাঁরা তঁ াদের পত্রিকায় কোন বানান বিধি গ্রাহ্য হবে তা নির্দেশ করে নিজস্ব প্রকাশনালয়ের রীতি বা house ব্দব্ধম্ভপ্তন্দ্ব হিসা বে 'একটি প্রাথমিক প্রস্তাব' এবং পরে ১৯৯১ সালে বার করলেন 'কী লিখবেন কেন লিখবেন'।
দেখা গেল চীন, নীচ, দেশী, বিদেশী ছাড়া এঁদের প্রায় সব প্রস্তাবই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমির সুপারিশের সঙ্গে মেলে।

১৯৯৩ এর ডিসেম্বর অণ সেন বার করলেন 'বানানের অভিধান--বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন'। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও হল। কোন বানান হওয়া উচিত কোনটি নয় তা তিনি স্পষ্ট তুলে ধরলেন। আপত্তির জায়গাগুলি ত্রমশই কমে আসছে। আসলে সবটাই একটা বড়ো প্রত্রিয়ার অংশ--বানানের অরাজকতা কমিয়ে আনা। বাংলা আক াদেমিও যে বানানবিধি গ্রহণ করল তাতেও লেখা হল যে এটাও চূড়ান্ত নয়, কিছুদিনের জন্য চূড়ান্ত।

মুদ্রাণযন্ত্রের বিবর্তনও বাংলা বানানে অন্তত লিপিবদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে। আগেকার ৫৫৬টি অক্ষরের থেকে যেভাবে ছাপানো হত তা লাইনো পদ্ধতিতে সরল হয়ে এল এখন আবার ডেস্কটপ প্রিন্টিং বা ফটো টাইপ সেটিং -এ আচারলিপি ফের পশ্চাদগামী হল বিবর্তনরেখা। কম তয় ত্ত এর বদলে ক্‌ত চালু হল লাইনো টাইপে, ডেস্কটপ প্রিন্টিং-এ আবার ত্ত ফিরে এল---এটা তো এগিয়ে যাওয়া নয়, পিছিয়ে যাওয়া।
বানান ব্যাপারে যাঁরা চূড়ান্ত অযৌত্তিক সেই ইংরেজরা দেখেছিল ঃ
A reformed spelling would sever a link between us and our literature of the 17th Century and earlier-
সুতরাং
a violent reform of spelling however desirable in theory has evoked no great enthusiasm in practice.
(দ্র. Chamber' Encyclopoedia p. 83-84)

বাংলা বানানরীতি নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করছেন তাঁদের একটা ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন বাংলা বানানের মধ্য দিয়ে একটা identity crisis অনুভব করছেন। সেটা এতদূর বিস্তৃত যে ই-কারকেই এঁরা মনে করছেন
খাঁটি বাংলা, আর ঈকার? সেটা যেন সংস্কৃত। কাছেই সংস্কৃতর ঋণ অস্বীকার করতে হলে ওটাকে পরিত্যাগ করা চাই---এটাই তাঁদের অন্তরগত অভিপ্রায়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com